

Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যাপদের ভাষা

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ মুর্তাজা আলী
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.3
Pages	86-106
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

চর্যাপদের ভাষা

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

Check for updates

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উষালগ্নে চর্যাপদের আবির্ভাব হয়েছিল। চর্যাপদেই বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম লক্ষণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই গীতিকাগুলি আবিষ্কারের কৃতিত্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। তিনি ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে মূল পুথি সংগ্রহ করেন ও প্রায় দশ বৎসর পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত পুথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্ত নামক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা ছিল। পরে ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদ অনেক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম প্রথম এই গীতিকাগুলি আদৌ বাংলা ভাষায় রচিত কিনা তা নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। বিজয় চন্দ্র মজুমদার History of Bengali Language বক্তৃতামালায় ১৯২০ সালে চর্যাগীতিকা হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় মিশানো বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে তাঁর বিখ্যাত Origin & Development of Bengali Language গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করে চর্যাগীতি যে বাংলা ভাষার আদিরূপ সে মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মত যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন।

ইদানীং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপালে প্রচলিত 'চাচা' গীতি নামক আধুনিক লোকগীতির সঙ্গে চর্যাপদের ছন্দ ও ভাষার মিল আবিষ্কার করেছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের মতে এই গীতিকার ভাষায় বাংলাভাষার ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বিবর্তনের ছাপ আছে। তাঁর মতে এই গীতিকাগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে চর্যাপদের বেশী মিল আছে। এই হিসাবে 'চাচাগীতি' চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন। এই গীতিগুলির সংখ্যা ২০। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃত ভাষার রীডার ডক্টর আরনল্ড বাকে ১৯৫৫ সালে নেপালের বজ্রাচার্য (বজ্র যান?) সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে এই সকল লোকগীতি tape recorder-এ রেকর্ড করেন।

চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন ডক্টর শহীদুল্লাহ। এ সম্বন্ধে তাঁর মতই পণ্ডিতগণ সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, মনীন্দ্র মোহন বসু, সুকুমার সেন ইত্যাদি পণ্ডিতগণ চর্যাপদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মনীন্দ্র বসু দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্যাপদ অধ্যাপনা করেন। চর্যাপদের রূপক অর্থ সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে শুধু শহীদুল্লাহ্ ও প্রবোধ বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের আলোচনা করে অর্থ নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইদানীং অতীন্দ্র মোহন মজুমদার চর্যাপদ সম্বন্ধে একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

চর্যাপদের বিষয়বস্তু — সহজিয়া মতবাদী বৌদ্ধদের ধর্মাচরণের বিধি-নিষেধ। চর্যাপদে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষার সাহায্যে তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধন প্রণালী ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিবর্তনের একটী বিশিষ্ট স্তরে বৌদ্ধ ধর্ম তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হয়। চর্যাপদগুলি এরই একটা বিশিষ্ট পর্বের ধর্ম সাধনার নিদর্শন বহন করে। এই গীতিকাগুলির মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের মনোময় ধর্মীয় জীবনের উপলব্ধির ব্যাখ্যা করেছেন।

এই প্রবন্ধে আমি প্রধানত চর্যাপদের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। ডক্টর সুনীতিকুমারের মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিম বঙ্গের। চর্যাপদে কিন্তু পূর্ববঙ্গের উপভাষা ও অসমীয়া ভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রচলিত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে বাংলা ও অসমীয়া ভাষা এসেছে। চর্যাপদের রচনাকালে বাংলা ও আসাম অঞ্চলে বঙ্গ-কামরূপী ভাষার প্রচলন ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অসমীয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে বিকাশ লাভ করে নাই। অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্দতর হওয়ায় এখনো প্রচলিত অসমীয়া ভাষায় অনেক বঙ্গ-কামরূপী ভাষার প্রাচীন শব্দের ব্যবহার

আছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার দ্রুত পরিবর্তন হওয়ায় ঐ সকল পুরানো শব্দ চলতি বাংলা ভাষা থেকে লোপ পেয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা অধিক পরিবর্তিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে ঐ সকল প্রাচীন শব্দ অপরিবর্তিত ভাবে পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষায় অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

চর্যাপদে অনেক স্থলে নাস্তিবাচক (negative) বাক্যে 'না' ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা 'ধরণ যায় না' অর্থে 'ধরণ ন জাই' ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় এ প্রকার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। রাঢ়ের কথ্য ভাষায় ও আধুনিক বাংলা ভাষায় নাস্তিবাচক 'না' ক্রিয়ার পরে আসে। বিভিন্ন চর্যায় সপ্তমী বিভক্তিতে 'ত' চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। এ রকম ব্যবহার পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, মনোমোহন ঘোষ, সত্যব্রত দে ইত্যাদি পণ্ডিতেরা মনে করেন চর্যাপদের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রশস্ত নদী বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় সীমারেখা নির্দেশ করত। আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর মূল প্রবাহ ময়মনসিংহ হয়ে বইত। ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রাচীন খাতের পূর্বদিকে — পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে-ভাষা ব্যবহৃত হত, তার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার বেশী মিল আছে। চর্যাপদে ব্যবহৃত রুখ (কাষ্ঠ), সাঙ্কম বা হাকম (সেতু), নাঠা (নষ্ট), উজাএ (উজান দিকে যায়), কাউয়া (কাক), সামায় (ঢুকে), বুড়াইল (ডুবাইল), খম্ভা (স্তম্ভ), আলাজালা (তুচ্ছ বস্তু), ঘিন (ঘৃণা), উভায় (দণ্ডায়মান হয়), ফাড়িমু (ছিন্ন করব), খৈড়া (খেলা), সুতেলা (শুইল) ইত্যাদি শব্দ অদ্যাপি পূর্ববঙ্গের বিশেষত সিলেটী উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। 'চর্যাপদের "দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়" উক্তিটি আধুনিক শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় প্রায় অবিকল ভাবে 'দোহাইল দুধ বানে সামায় না' আকারে মেলে (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম—পৃঃ ২ —সুখময় মুখোপাধ্যায়)।

চর্যাপদের উজু (সোজা), বপা (বাপু), নই (নদী), টাকলি (শৃঙ্গ), বহল (বিস্তৃত), গোহালি (গোশালা), গেলি (গেল), চৌদিকে (চতুর্দিকে)

পহুম (পদ্ম), মোলান (মৃণাল), তিনি (তিন), ডালি (ক্ষুদ্র ডাল), দাপণ (দর্পণ), টাঙ্গী (কুঠার), বাট (পথ), হেরি (দেখি), কেরুয়াল (দাঁড়), আজি (আজ), রাতি (রাত), ইত্যাদি শব্দ এখনও অসমীয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সুকুমার সেন বলেছেন 'কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬০) অধ্যাপক সত্যব্রত দে-র মতে "পউআ খালের বিশেষ উল্লেখ, তাহা ছাড়া খাল বিখালা. নদী মাতৃকতা, আসাম সীমান্তের হাতী ধরার বিষয়—ইত্যাদি পূর্ববঙ্গীয় জীবন যাত্রার নির্ভুল ইঙ্গিত।"

প্রথমা বিভক্তিতে 'এ'র ব্যবহার, দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ পাওয়া, তৃতীয়া বিভক্তিতে 'এ', চতুর্থীতে 'ক', ষষ্ঠীতে 'র', ও সপ্তমীতে 'ত'র ব্যবহার চর্যাপদে পাওয়া যায়। চর্যাপদে অসমাপিকা ক্রিয়াতে 'হ'র, ভবিষ্যৎ কালে 'ম' ও অতীত কালে 'ল'র ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল লক্ষণ থেকে অসমীয়া ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে।

চর্যাপদের কয়েকজন লেখক যে কামরূপ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সুনিশ্চিত, টেঙ্গুয়ের কেটেলগে লুইপাদকে বঙ্গদেশবাসী ও 'গ্রাবওটাব' নামক তিব্বতী গ্রন্থে তাকে কামরূপের কৈবর্তের সন্তান বলা হয়েছে। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। লৌহিত্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী লৌহিত্য পাদকে লুইপাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক রাজমোহন নাথের মতে (কদলী রাজ্য পৃঃ ১১) লুইপাদ আসামের নওগা জেলার হোজাই বা ওড্ডীয়ানের অধিবাসী ছিলেন। লুইপাদের দীক্ষা গুরু ছিলেন শবরীপাদ। কাজেই শবরীপাদও হয়ত কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সরহপাদ পূর্বদেশে রাজ্ঞী রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। আহোমদের আমলে কামরূপের গৌহাটী শহরের ১৬ মাইল দূরে 'রানী' নামে এক সামন্ত রাজ্য ছিল। (vide, An Account of Assam by Francis Hamilton P. 31)। সরহপাদ এই রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। (vide, Introduction to Buddhist Esoterism P. 46) সরহপাদের রচিত চর্যায় অসমীয়া ভাষার প্রভাব বিশেষরূপে

লক্ষ্য করা যায়। Dr. Grunwedel এর মতে কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালই সিদ্ধাচার্য দারিকপাদ। ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "কয়েকটি পদে মত্ত হস্তী, হাতী ধরিবার রীতির উল্লেখ আছে। কামরূপ অঞ্চলের কোন সিদ্ধাচার্য হয়ত এই পদ রচনা করিয়া থাকিবেন।" ৯, ১৬ ও ১৭ নং চর্যায় হাতীর উল্লেখ আছে। এই চর্যাগুলির লেখক কৃষ্ণপাদ, মহীধর পাদ ও বীণা পাদ।

সুকুমার সেনের মতে চাটিল পাদ হয়ত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সিদ্ধাচার্যেদের মধ্যে তিলোপা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জালন্ধরী পাদ কিছুকাল চট্টগ্রামে বাস করেছিলেন। কাজেই এদের একজন চাটিল পাদ হতে পারেন। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে ডোম্বীপাদ ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন।

চর্যাপদে গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, বাঙ্গালী, ওড্ডিয়ান, কামরু, লঙ্কা ইত্যাদি ভৌগোলিক নামের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক জেকোবি আসামের নওগা জেলার লঙ্কাকে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের লঙ্কা বলে মনে করেন। প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থ Blue Annals (Vol I, P. 367) এ লেখা আছে "The country of oddiyana was situated 230 yoyanas to the north of Magadha (সুখময় মুখোপাধ্যায়ের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম পৃঃ ২) উড়িষ্যা মগধের দক্ষিণে। আসামের নওগা জেলার হোজাই মগধের উত্তরে। Waddel সাহেব ওড্ডীয়ানের স্থান নির্দেশ করেছেন সোয়াত উপত্যকায়। ডক্টর শহীদুল্লাহ এই মত গ্রহণ করেছেন। হিউয়েন সাং যখন (সপ্তম শতাব্দীতে) ভারত ভ্রমণ করেন তখনই ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে। কাজেই এরপরে সোয়াত উপত্যকায় তান্ত্রিক ধর্মের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। হর প্রসাদ শাস্ত্রী ওড্ডীয়ান বলতে উড়িষ্যা বুঝেছেন।

কামরূপ অতি প্রাচীনকাল থেকে সহজিয়া ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে কামাখ্যাকে আদিপীঠ ও ওড্ডীয়ানকে মহাপীঠ বলা হয়েছে। বজ্রযোগিনী সাধনার মন্ত্রে ওড্ডীয়ান, কামরূপ ও শ্রীহট্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ওড্ডীয়ান কামরূপ ও শ্রীহট্টের নিকটে অবস্থিত হওয়া সম্ভব মনে হয়। রাজমোহন নাথের মতে আসামের নওগা জেলার হোজাই নামক স্থানই প্রাচীন ওড্ডীয়ান (Vide : Journal of

Assam Research Society 1941 P. 49) চর্যাপদে যে সকল ভৌগোলিক নামের উল্লেখ আছে, সেগুলি সবই বঙ্গদেশ ও আসামে অবস্থিত। কাজেই ওড্ডীয়ান খুঁজতে সুদূর সোয়াত উপত্যকায় যাওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় না।

চর্যাপদে অনেক মৈথিলী অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পেখম, জম্ম, বম্ম, অইসন, জইসন, জিম, তিম, কাহে, পীবমি, পূছমি, তোড়িআ, ভনথি, বুলথি ইত্যাদি বহু মৈথিলী শব্দ চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

এই বাক্যে 'বি'ও 'পইঠো' শব্দ মৈথিলী। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে অজদেবের ভাষা ওড়িয়া ও শান্তিদেবের ভাষা মৈথিলী অপভ্রংশ।

এখন চর্যাপদের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা থাক। আমরা পূর্বেই বলেছি অনেকের মতে কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালই ছিলেন সিদ্ধাচার্য দারিক-পাদ। কনকলাল বড়ুয়া (Early History of Kamrupa p. 142) ও রাজমোহন নাথের মতে (Back ground of Assamese culture, Appendix I) মতে ইন্দ্রপালের রাজত্বকাল ১০৩০ থেকে ১০৫৫ সাল। অনেকের মতে লুইপাদ বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। কাজেই লুইপাদের সময়ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ মনে করা যেতে পারে। লুইপা দারিকপা'র গুরু ছিলেন। কাজেই লুইপাকে ১০০০—১০৩০ খ্রীঃ ও তাঁর গুরু শবরকে ৯৭০—১০০০ খ্রীঃ ও শবরের গুরু সরহপাদকে ৯৪০-৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন মনে করা যেতে পারে। কনকলাল বড়ুয়ার মতে সরহপাদ দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। Pag Som Jon zan গ্রন্থে নারোপাকে রাজা মহী পালের (৯৭৪—১০২৬ খৃঃ) সমসাময়িক বলা হয়েছে। নারোপার অন্য নাম ছিল কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য। কৃষ্ণাচার্যের নামে ১৩টী চর্যা পাওয়া গেছে। সবগুলি চর্যাই এক কৃষ্ণাচার্যের লেখা নহে। তবে অন্তত একজন কৃষ্ণাচার্য যে দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন তা সঠিকভাবে অনুমান করতে বাধা নেই। শান্তিপা ও Pag Som Jon Zan এর মতে মহীপালের

সমসাময়িক। Blue Annals মতে শান্তিপা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। লামা তারানাথ অতীশের পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে ভুসুকুর নাম উল্লেখ করেছেন। কাজেই ভুসুকু বোধ হয় একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন। "Cordier এর Catalogue du Fords Tibetan এর ২য় খণ্ডের ২১১—১২ পৃষ্ঠায় একটী গুরু প্রণালী দেওয়া আছে, তা থেকে পাওয়া যায় যে ভোম্বীপা দারিকপার শিষ্যা সহযোগিনী চিন্তার শিষ্যা" (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" পৃঃ ১২)। কাজেই ডোম্বীপা একাদশ শতাব্দীর শেষে জীবিত ছিলেন মনে করা যেতে পারে।

চর্যাগীতির রচনাকাল সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত মতের সঙ্গে ডক্টর সুনীতি কুমারের মতের মিল আছে। সুনীতিবাবু চর্যাগীতির ভাষা দশম একাদশ শতকের বলে অনুমান করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে একমত। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদ সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে চর্যাপদগুলি অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত।

চর্যাগীতির রচনাকালে পালরাজারা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১২৬৭) ৯০০ থেকে ১০৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ও সমতটে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা সকলেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অতঃপর চর্যাপদের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যচ্ছে।

১নং চর্যা এড়ি এউ ছান্দক বন্ধ করণক পটের আস,
সুনুপাখে ভিতি লেহুরে পাস।

অর্থাৎ এড়িয়ে যাও ছন্দের বন্ধন ও কপটের আশা। শূন্য পাখা পাশে চেপে ধর।

মণীন্দ্রবসু ও সুকুমার সেন 'করণক পটের আস' কথার অর্থ করেছেন পারিপাট্যের আশা। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে ডক্টর শহীদুল্লাহও প্রবোধ বাগচী অর্থ করেছেন 'কপটের আশা।' তাঁদের মতই অধিক সমীচীন মনে হয়। রাজমোহন নাথের মতে উক্ত দুইপদের অর্থ হচ্ছে — মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, আদি হঠযোগের বিরাট সাধনা ত্যাগ করে শুধু নৈরাত্ম ধর্মপাশ আশ্রয় কর।

'ভনই লুই আমহে ঝাণে দিঠা,
ধমন চমন বেনি পিণ্ডি বইঠা।'

অর্থাৎ লুই বলেছেন 'আমি ধ্যানে দেখেছি। ধমন চমন দুই পিঁড়িতে আমি উপবিষ্ট।' রাজমোহন নাথের মতে এই পদের অর্থ ঃ লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখেছি। ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞা চক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ বীজ-বেষ্টিত (অ থেকে ল পর্যন্ত আলি অর্থাৎ ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী বেষ্টিত এবং ক থেকে ল পর্যন্ত কালি, পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ী বেষ্টিত) ত্রিকোণাকার মণ্ডল মধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুর মূর্তির ধ্যান করা।

২নং চর্যা দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই,
রুখের তেন্তুলী কুম্ভীরে খাএ।

অর্থাৎ স্ত্রী কচ্ছপ দোহন করে ধরে রাখা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল কুম্ভীরেই খায়।

দুলি বা দুরি শব্দের অর্থ সিলেটী উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় স্ত্রী কচ্ছপ। 'যায় না' অর্থে 'ন জাই' বাক্যাংশের ব্যবহার হিন্দী, অসমীয়া, সিলেটী ও চট্টগ্রামী উপভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাষ্ঠ অর্থে রুখ শব্দের ব্যবহার পালি, প্রাকৃত ও সিলেটী উপভাষায় পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বানন্দ রচিত টীকা সর্বস্বে তিন্তিলী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

অঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বি আতী
কানেট চোরে নিল আধরাতী।

অর্থাৎ ঘরের মধ্যে আঙ্গিনা বা উঠোন। ওগো অবধূতী, শুন, অর্ধেক রাত্রে চোরে কানফুল নিয়ে গেল।

ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে বি আতি শব্দের অর্থ বাইতী—বাদ্যকরী। মুনি দত্তের টিকা মতে এই শব্দের অর্থ অবধূতী। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি। সুকুমার সেনের মতে বধূ। এস্থলে অবধূতী শব্দ অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে কানেট শব্দের অর্থ নেকড়া। বিদ্যাপতির কাব্যে এই অর্থে কানেট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে কানেট শব্দের অর্থ

কন্থাপট। তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্যের টীকায় কানেটের অর্থ ধরা হয়েছে কর্ণ-ভূষণ। অধিকাংশ পণ্ডিতই কানেটের অর্থ কর্ণ-ভূষণ মনে করেন।

দিবসে বহুড়ী কাউই ডরে ভাএ
রাতি ভইলে কামরু জাএ।

অর্থাৎ দিনের বেলায় বউটী কাকের ভয়েই ভীত। রাত্রে সে কিন্তু কামরূপ (কাম চরিতার্থ করতে) যায়।

তবকতে নাসিরী ইত্যাদি ইতিহাসে ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শিলালিপিতে কামরূপ অর্থে কামরু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কামরূপ অতি প্রাচীন কাল থেকে তান্ত্রিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বজ্রযোগিনী সাধনার মন্ত্রে কামরূপের উল্লেখ আছে। এই পদে কাক অর্থে কাউই ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় কাককে বলে কাউই।

অইসাণি চর্যা কুক্কুরী পাএ গাইড়
কেড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়।

অর্থাৎ কুক্কুরীপাদ এ রকম চর্যা গাইলেন। কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে তা প্রবেশ করল।

চর্যা শব্দটীর মূল অর্থ ছিল — আচরণ, ব্যবহার। অসমীয়া ভাষায় চর্যা শব্দের অর্থ অভ্যাস। এই অর্থে 'জড়যোগ চর্যা করি পর্যটিলা ভূমি'। অসমীয়া কীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অইসণি' শব্দটি হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রবেশ করা অর্থে 'সামায়' বা 'হামায়' রূপে সমাইড় শব্দটী অসমীয়া ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন এই অর্থে 'সামায়' শব্দের ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত আছে।

৫নং চর্যা ভব নই গহন গম্ভীর বেগে বাহী
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।

অর্থাৎ ভবনদী গভীর ও গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। তার দুইধারে কাদা। মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। অসমীয়া ভাষায় নদী অর্থে নৈ শব্দের ব্যবহার আছে।

ধমার্থে চাটিল সাঙ্কম গড়ই,
পারগামি লোএ নিভর তরই।

অর্থাৎ ধর্মসাধনার জন্য (নদীর উপরে) চাটিল একটী সাঁকো গড়ে দিয়েছেন, যাতে ওপারে যেতে ইচ্ছুক (ব্যক্তিরা) নির্ভয়ে পার হতে পারে।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায় সাঁকো অর্থে সাকম বা হাকম শব্দের ব্যবহার আছে।

এই চর্যায় ফাড়িঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ,
অঙ্গঅদিঢ়ি টাঙ্গী ণিবানে কোড়িঅ।

অর্থাৎ মোহতরু ছিন্ন করা হয়েছে, পাটি ও জোড়া দেওয়া হয়েছে, অদ্বয় (জ্ঞানরূপ) টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণে দৃঢ় কর।

অসমীয়া ভাষায় ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ছিন্ন করা অর্থে ফাড়া শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা 'কোবাই আমি কার ফাড়িব ছাল' (তোকে মেরে মেরে চামড়া ছিঁড়ে দেব) ইত্যাদি অসমীয়া কীর্তনের পদে ছিন্ন করা অর্থে ফাড়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬নং চর্যা তরঙ্গতে হরিণার খুর না দীসঅ,
ভুসুক ভনই মূঢ়া হিঅহি ন পইসই।

অর্থাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে চলার জন্য হরিণের খুর দেখতে পাওয়া যায় না। ভুসুক বলেছেন, মূঢ়ের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে না।

ডক্টর শহীদুল্লাহ এই চর্যায় 'তরসতে' স্থলে 'তরঙ্গতে' পাঠ শুদ্ধ মনে করেন। 'তরঙ্গতে' শব্দের অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। প্রবোধ বাগচী মূল গ্রন্থ ও তিব্বতী অনুবাদ থেকে তরসতে (অর্থাৎ ভয়ে) পাঠ শুদ্ধ মনে করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ মনে করেন তরঙ্গতে শব্দের সঙ্গে অর্থ সৌকর্য থাকায় তিব্বতী অনুবাদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাই।

৭নং চর্যা আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা,
তা দেখি কানু বিমন ভইলা।

অর্থাৎ আলি কালিতে পথ রুদ্ধ হল। তা দেখি কানু বিমর্ষ হল।

এস্থলে পথ অর্থে বাট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় পথ অর্থে বাট শব্দ আজও প্রচলিত আছে।

৮নং চর্যা সোনে ভরিলী করুণা নাবী,
রুপা থোই নাহিকো ঠাবী।

অর্থাৎ করুণা (রূপ) নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ। রূপা রাখার জায়গা নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে শুদ্ধ পাঠ 'মহিকো ঠাবী' অর্থাৎ মহীর কাছে।

এই চর্যায় বাহতু কামলি গঅন উবেসে,
গেলী জাম বহুড়ই কইসে।

অর্থাৎ কামলি, তুমি গগন উদ্দেশ্যে নৌকা বেয়ে চল। দেখি, গত জন্ম কিসে ঘুরে আসে। এস্থলে ফিরে আসা অর্থে বহুড়ই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় ফিরে আসা অর্থে বহুরি শব্দ প্রাচীন পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা 'অবহু বহুরি নাথ দরশন দেনে' — বরগীত।

৯নং চর্যা এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িঅ।

অর্থাৎ এবং প্রকার দৃঢ় বন্ধন স্তম্ভ ভেঙ্গে বিবিধ ব্যাপক বন্ধন টুটে ফেলে।

এস্থলে আলান (হাতী বাঁধার থাম) অর্থে বাখোড় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বানন্দের টীকা সর্বস্বেও বাখোড় শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

১৩নং চর্যা তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী
নিঅ দেহ করুণা শুন মেহেরী।

অর্থাৎ ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) হল নৌকা। নিজ দেহকে করুণা ও শূন্যে দর্শন করে অষ্টকুমারী (অষ্টপ্রকার বুদ্ধৈশ্বর্য সুখ) অনুভূত হল।

সুকুমার সেন অঠকমারীর অর্থ করেছেন আটটী কামরা। কামরা শব্দ কিন্তু পর্তুগীজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষাতে এসেছে। পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলা দেশে আসে নাই। কাজেই অঠকমারী বাক্যাংশের অর্থ আট কামরা মনে করা যুক্তি সঙ্গত নয়।

১৪নং চর্যা গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করই।

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা বাওয়া হয়, তাতে নিমজ্জিত মাতঙ্গী যোগীকে অবহেলায় পার করে দেয়।

এস্থলে ডুবিলি অর্থে বুড়িলি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় ডুবিলি অর্থে বুড়িলি শব্দের ব্যবহার আছে। Metathesis (শব্দের বর্ণ সমূহের পরস্পরের স্থান পরিবর্তন) প্রক্রিয়ায় ডুবিলি শব্দ বুড়িলি হয়েছে। চৈতন্যমঙ্গলে আছে —

'ঐছন প্রেমের রঙ্গে অঙ্গ বুড়াইল সঙ্গে
পাসরিল পুরুষের তাপ।

এই পদে ডুবল অর্থে বুড়াইল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ 'বুড়িলী' স্থলে 'চুড়িলী' পাঠ সঙ্গততর মনে করেন। এশিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত পুথিতে 'চুড়িলী' পাঠ পাওয়া যায়।

ডক্টর শহীদুল্লাহ 'যোইআ' স্থলে 'পোইআ' পাঠ শুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু মুনিদত্তের টীকায় যোগীন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যোইআ পাঠকে সঙ্গততর মনে করা যেতে পারে।

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদগুরু পাঅপএঁ জাইব পুন জিনউরা।

অর্থাৎ ডোমনি, তুমি নৌকা বেয়ে চল। পথে দেরী হল। সদগুরু প্রসাদে আবার জিনপুর যাব। প্রবোধ বাগচীর মতে উছারা শব্দের অর্থ সরল। তিনি তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণ করেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেন উছারা শব্দের অর্থ করেছেন বিকাল বেলা। উছারা বোধ হয় উচ্চ অর্থাৎ অতিরিক্ত (বেলা) শব্দ থেকে এসেছে।

পাঞ্চ কেড়আল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী
গঅন দুখোলে সিঞ্চহে পানী ন পইসই সান্ধি।

অর্থাৎ পাঁচটী বৈঠা পড়ছে, পিছনের গলুইয়ে কাছি বাঁধা (আছে); গগন সেউতিতে জল সেচ, যেন নৌকায় জল প্রবেশ না করে।

অসমীয়া ভাষায় দাঁড় অর্থে কেড়ুয়াল শব্দ ব্যবহৃত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকাতেও কৈড়োয়াল শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই চর্যাপদে কাছি টানার নির্দেশ আছে। সত্যব্রত দে মনে করেন এ স্থলে পূর্ববঙ্গের দড়াজালের সাহায্যে মাছ ধরার বর্ণনা করা হয়েছে। চর্যাকারদের জীবনের সঙ্গে নদীর ঘনিষ্ট যোগাযোগ দেখে মনে হয়, পূর্ববঙ্গই চর্যাপদের মূল উৎস।

পাপপুন্য বেনি তোড়িআ সিকল মোড়িঅ খম্ভা ঠানা
গঅন টাকলি লাগিরে চিত্তা পইঠ নিবানা।

অর্থাৎ পাপপুণ্য এই দুই শিকল ছিন্ন করে স্তম্ভ ভেঙ্গে গগন শিখরে উঠে চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করল।

খাম্ভা বা খাম্বা শব্দের অর্থ সিলেটী উপভাষায় স্তম্ভ। টাকলির অর্থ কেউ কেউ মনে করেছেন শিখর। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন টাকলি শব্দের অর্থ অনাহত ধ্বনি। অসমীয়া ভাষায় টাকলি শব্দের অর্থ অনাহত ধ্বনি। তিব্বতী অনুবাদেও এই অর্থে টাকলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭ নং চর্যা যবে করহা করহ কলে চাপিউ
বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এই পদের অর্থ হচ্ছে এই: যখন হাতের পাশ করতলে চাপা হয় (হাত চেপে সুর তোলা হয়) তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনিতে সকল ব্যাপ্ত হয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্র মতে 'যবে করহ করহকলে চাপিউ' বাক্যাংশের অর্থ—'যখন উট উটের কলে চাপা পড়ল'। তিনি বলেন সরহ পাদের দোহায় করহা শব্দ উট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মতে মুনিদত্তের টীকায় উষ্ট্রং শব্দ ছিল। লিপিকরের দোষে উহা উষ্ণং বলে পঠিত হয়েছে। বিয়াপিউ শব্দের অর্থ ব্যাপ্ত হল। অসমীয়া ভাষায় ব্যাপ্ত হওয়া অর্থে বিআপিউ শব্দ এখনো ব্যবহৃত হয়। তিব্বতী অনুবাদে 'যবে করহ করহা কলে চাপিউ' বাক্যাংশের অর্থ করা হয়েছে: যখন ছোট কাঠ বড় কাঠের সঙ্গে ঘর্ষিত হল। এই অর্থও সুসঙ্গত বলে মনে হয় না।

১৮ নং চর্যা কইসনি হলো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলি
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবালী।

অর্থাৎ ওগো ডোম্বী, কি রকম তোমার চতুরালি। (তোমার) অন্তে কুলীন জন মাঝখানে কাপালিক!

ভাভরি আলি শব্দের অর্থ নাগরালি। তিব্বতী ভাভরিকে বাবরির (চুল) সঙ্গে ভুল করা হয়েছে।

২১ নং চর্যা তবে সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল
সদগুরু বোহে করিহ সে নিচ্চল

অর্থাৎ মূষিক ততক্ষণ আনন্দে উদ্বেলিত, যতক্ষণ না সদ্গুরুর উপদেশে নিশ্চল হয়। উঞ্চলপাঞ্চল অসমীয়া ভাষায় উচলপাচল এবং এর অর্থ আনন্দে উত্তেজিত।

কাল মুষা উহ ন বান
গঅনে উঠি চরঅ অমন ধান।

অর্থাৎ মূষিক কৃষ্ণবর্ণ, তার উদ্দেশ (ও গায়ের রং দেখা যায় না)। গগনে উঠে সে অন্যমনস্ক ধ্যান করে।

ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে দ্বিতীয় চরণের অর্থ 'গগনে উঠে ইঁদুর আমন ধানে চরে।' হৈমন্তি থেকে আমন শব্দ এসেছে। কাজেই আমন শব্দ হয়ত প্রাচীন কালেও ব্যবহৃত হত। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে গূঢ়ার্থে — পরমার্থ বোধিচিত্ত রূপ মধুপান আস্বাদন করে। এই অর্থ মুনিদত্তের টীকা থেকেও পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয় অন্যমনস্ক ধ্যান অর্থ অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

২৬নং চর্যা। বহল বাট দুই মারনা দিশএ,
শান্তি ভনই বালাগ্র ন পই সাই।

অর্থাৎ বিস্তৃত পথ, এর দুই দিক দৃষ্টিগোচর হয় না। শান্তি বলেন, কেশাগ্রও ঢুকতে পারে না। এস্থলে বহল বাট বিস্তীর্ণ পথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় বিস্তীর্ণ পথ অর্থে এই বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। মণীন্দ্র বসুর মতে বহল শব্দের অর্থ দৃঢ়। অতীন্দ্র মজুমদার মনে করেন বহল শব্দের অর্থ কর্দমাক্ত। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণ করে প্রথম চরণের অর্থ করেছেন — 'চলন পথে দ্বয়াকার দেখা যায় না।'

২৮নং চর্যা। নানা তরুবর মৌলিল রে গঅনত লাগেলি ডালী
একেলা সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।

অর্থাৎ নানা পুষ্পে তরুবর মুকুলিত, গগনে সেই বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা প্রসারিত। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবরী একা সেই বনে বিচরণ করে।

এস্থলে ক্ষুদ্র ডাল অর্থে ডালী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গগনের দিকে ক্ষুদ্র ডালই সাধারণত বিস্তৃত হয়। অসমীয়া ভাষায় ক্ষুদ্র ডাল অর্থে ডালি শব্দের ব্যবহার আছে।

৩১নং চর্যা জহি মন ইন্দি অরণ হো নঠা,
ন জানমি অপা কঁহি গই পইঠা।

অর্থাৎ যেখানে মন ও ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়; জানি না আত্মা কোথায় প্রবেশ করল।

এস্থলে নষ্ট অর্থে নঠা বা নাঠা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সিলেটী উপভাষায় নষ্ট অর্থে নাঠা শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লো আচার,
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর।

অর্থাৎ ভয়, ঘৃণা ও লোকাচার ছেড়ে দিয়েছি। চেয়ে চেয়ে দেখছি শূন্য বিকার।

ঘৃণা অর্থে ঘিণ শব্দ সিলেটী উপভাষা ও অসমীয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৩২নং চর্যা উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক,
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।

অর্থাৎ সোজাপথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা। বোধি নিকটেই, লঙ্কায় (অর্থাৎ দূরে) যেও না। উজু শব্দ পালি ভাষা থেকে এসেছে। সরল অর্থে অসমীয়া ভাষায় উজু শব্দের ব্যবহার আছে। এই চর্যার লেখক সরহপাদ আসামের অধিবাসী ছিলেন।

বাংলা প্রবাদ আছে কানা খোড়া কুঁজো,
তিন না চলে উজো।

দক্ষিণ রাঢ়ে প্রচলিত আছে বলে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন। এস্থলে সোজা অর্থে উজু শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এই চর্যায় দাপণ, মুকল ও বাপা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় দর্পণ অর্থে দাপণ, মুক্ত অর্থে মুকল, বাপু (আদরে সম্বোধন) অর্থে বাপা শব্দের ব্যবহার আছে।

৩৩নং চর্যা টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী,
হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেসী।

অর্থাৎ টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই। হাড়ীতে ভাত নাই তবু নিত্য প্রেমিক (অতিথি) আসে। ডক্টর শহীদুল্লাহ টালত শব্দের অর্থ করেছেন টোলাতে অর্থাৎ শহরে। তিনি মনে করেন এস্থলে Oxymoron

(বিরোধ আভাস) প্রয়োগে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। তিব্বতী অনুবাদে টাল শব্দের অর্থ নগর বলা হয়েছে। এখনও পাহাড়ী জাতিরা টিলার উপরে বাস করা পছন্দ করে। টিলাতে যারা বাস করে তাদের প্রতিবেশী না থাকা সম্ভব। শহরে যারা বাস করে তাদের প্রতিবেশী থাকাই স্বাভাবিক।

৩৮নং চর্যা বাটত ভএ খাণ্ট বলআ,
ভব উলোলে সব বি বোলিআ।

অর্থাৎ পথে উন্মত্ত দস্যুর ভয়। ভবসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সকলেই বিনষ্ট।

খাণ্ট শব্দের অর্থ ডাকাত। অসমীয়া ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিতে 'দারুণ নির্দয় দুষ্ট যেন খাণ্ট চোর' পদে ডাকাত অর্থে খাণ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বলআ, অসমীয়া বলীয়া, উন্মত্ত। এই চর্যার লেখক সরহপাদ আসামের অধিবাসী ছিলেন।

৩৯নং চর্যা অকট হু ভব গঅনা,
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিনানা।

অর্থাৎ আশ্চর্য বা অদ্ভুত হুঙ্কার থেকে উদ্ভূত এ গগন; বঙ্গে জায়া গ্রহণ করায় তোর বিজ্ঞান ভেঙ্গে গেল। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে বঙ্গে জায়া নিয়ে গিয়েছিল। এস্থলে বঙ্গ-কামরূপের রমণীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এই চর্যার লেখক সরহপাদ কামরূপের অধিবাসী ছিলেন।

সুইনেহ অবিদার অ রে ণিঅমন তোহোরেঁ দোষে,
গুরু বঅন—বিহারেঁ রে থাকিব তহ ঘুণ্ড কইসে।

অর্থাৎ ওরে মন, স্বপ্নেও তুমি তোমার নিজের দোষে অবিদ্যারত। গুরু বচন বিহারে তুমি কি করে ঘুরবে?

ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে ঘুণ্ড শব্দের অর্থ গুণ্ডা। প্রথমে কিন্তু তিনি তিনি ঘুণ্ডা শব্দের অর্থ ঘুরা মনে করেছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করেছেন। ডক্টর বাগচী তিব্বতী অনুবাদ থেকে ঘুণ্ডা শব্দের অর্থ করেছেন ঘুরা। তাঁর মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

সরহ ভনই বর সুন গোহালী কিমো দুটঠা বলন্দে,
একেলে জগ নাশি ওরে বিহরহু স্বচ্ছন্দে।

অর্থাৎ সরহ বলেছেন, দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়ালঘর ভাল। একা জগৎ নষ্ট করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর।

গোহালী শব্দের অর্থ অসমীয়া ভাষায় গোয়ালঘর। সরহপাদ আসামের অধিবাসী ছিলেন।

৪০নং চর্যা জো মন গোএর আলাজালা,
আগম পোথী ঠঠা মালা।

অর্থাৎ "যাকিছু মনোগোচর বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য সবই বিকল্পাত্মক, তাই যা কিছু আমরা মনের দ্বারা জানি, সবই ইন্দ্রজালের মত মায়াময়; আগম পুথি শাস্ত্রজ্ঞান — সবই তো মনের দ্বারা আমরা লাভ করি, তাহলে সহজানন্দকেও কি আমরা মনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারব?" (অতীন্দ্র মজুমদার।)

আলাজালা = অসমীয়া আলেজালে — অসার্থক। কবি আলাওলও আলাজালা শব্দ ব্যবহার করেছেন। সিলেটী প্রবাদ বাক্যে আছে:

ভাদেশ্বরীর আলাজালা,
কুকু বইনে জাল আলা।

আলে গুরু উইসই সীস,
বাক পথাতীত কহিব কিস।

অর্থাৎ গুরু বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেয়। যা বাক্যের অতীত তা কেমনে ব্যাখ্যা করা যাবে? 'আলে'র অর্থ অসমীয়া ভাষায় বৃথা।

৪৫নং চর্যা মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা,
আশা বহল পাতহ বাহা।

অর্থাৎ মন তরু, পাঁচটী ইন্দ্রিয় তার ডাল, আশারূপ বিস্তৃত পত্রবাহী।

বহল শব্দের অর্থ অসমীয়া ভাষায় বিস্তৃত।

। ২ ।

॥ চর্যাপদে কাব্যরস ॥

বাঙালীর প্রাণাবেগ সর্বপ্রথম বিস্তৃত হয় এই চর্যাপদে। চর্যাকারগণ সুকঠিন ধর্মতত্ত্বের পাশে কাব্যের চিত্রকুশলী উপমা-রূপকের সাহায্যে বাংলার চিরন্তন রোমান্টিক সুর ধ্বনিত করেছেন। যথা ঃ

উচা উচা পাবত তহি বসই সবরী বালী,
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী
গুহাড়া তোহারি।
নি অ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী
একেলা সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী।

অর্থাৎ শবরী বালা উচা পাহাড়ে বাস করে। সে ময়ুরের পাখা পরিধান করেছে ও তার গলায় আছে গুঞ্জার মালা। পাগল শবর, তুমি গোলমাল কর না। সহজ সুন্দরী আমি যে তোমারি নারী। গগনের কোলে কায়াতরু নানা ভাবে মুকুলিত হল। কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে শবরী একা এ বনে ভ্রমণ করে।

'শবরী বালিকা লীলাময়ী, তার সর্বাঙ্গে একটী আরণ্য সৌন্দর্য। তার কাণের কুণ্ডল হয়ত সকলের চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। নির্জন পার্বত্য প্রদেশ জুড়ে তার সবল সহজ সৌন্দর্যটী আলোর মত সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। শবরীর সামনে পিছনে চারদিকে নানা বৃক্ষে কত অগণিত বিচিত্র ফুল, গাছের ডালে ডালে আকাশ যেন ছেয়ে গেছে, আর সেই নীরব বনভূমে একলা দাঁড়িয়ে আছে শবরী — পুষ্পিত একটী লতার মত।' (অতীন্দ্র মজুমদার)। এই পরিবেশটা কত সুন্দর ও সুষমাময়।

আবার ১০নং চর্যায় :

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরী কুড়িআ
ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ।
আলো ডোম্বী তো এ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।
এক সো পদমা চৌষটঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাবঅ ডোম্বী বাপুড়ী।
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
অইসসি জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ।
সরবর ভাঙ্গি অ ডোম্বী খাঅ মোলান
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।

অর্থাৎ ডোম্বী, তোমার কুঁড়েঘর নগরের বাইরে। তুমি ব্রাহ্মণ নেড়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। আমি তোমাকে সাঙ্গা করব। আমি কাহ্ন কাপালিক, উলঙ্গ যোগী — আমাকে ঘৃণা করিও না। একটী পদ্মে চৌষট্টি পাপ্‌ড়ি — তার উপরে ডোম্বী ও বাপুড়ী। ওলো ডোম্বী তোমাকে সদভাবে জিজ্ঞাসা করছি 'তুমি কার নায়ে আসা যাওয়া কর? সরোবর ভেঙ্গে ডোম্বী মৃণাল খায়। ডোম্বী তোমাকে মারব — নেব তোমার প্রাণ।

এস্থলে যে রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে তা আমাদের অতি পরিচিত। প্রেমনিবেদনের ভঙ্গীটি আনন্দদায়ক। এই অন্ত্যজ যোগিণীর প্রেম লাভের জন্য কি গভীর আকুলতা। যে গভীর আবেগের সাথে এই আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারিত হয়েছে — তার আবেদন অনস্বীকার্য। এই সকল মনোরম চিত্রের সার্বজনীন আবেদন ও সাহিত্যিক মূল্য ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও অস্বীকার করা যায় না।

আবার ২৮নং চর্যায় :

তিআ ধাউ ঘাট পড়িলা সবরো মহা সুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেম্ম রাত পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।

অর্থাৎ তিন ধাতুর খাট পাতা হল, শবর মহামুখে শয্যা বিছাল; শবর নাগর নৈরামণি নাগরীর প্রেম সম্ভোগে রাত অতিবাহিত করল। হৃদয় তাম্বুল সঙ্গে মহা আনন্দে কর্পূর খেল। শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করে মহা সুখে রাত কাটাল।

ত্রিধাতুর খাটে পান মুখে বক্ষলগ্ন বধূর সাহচর্যে মিলনমধুর প্রেমিকের চিত্রটী বাস্তবিক কাব্যময়।

ইতিহাসের ব্যবধানে ভাষার ও রচনাবলীর পরিবর্তনে চর্যাগীতির প্রধান মূল্য বর্তমানে — ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। তথাপি অনেক চর্যার সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

"সাহিত্যিক মানবিকতার উদ্বোধন বাংলা কাব্যে প্রথম হয়েছে চর্যাপদে। তার প্রবাহ আজও চলছে সমস্ত বাঙালী কবির মধ্যে।"

স্বাধীনতা লাভের পরে পূর্ব পাকিস্তানে চর্যাপদ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি। শুধু ১৩৬৮ সালের ভাদ্র মাসের পূবালীতে 'চর্যাপদের বাংলা দেশ' নামক প্রবন্ধে জনাব আতোয়ার রহমান একটা তথ্য সমৃদ্ধ মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে আমি প্রধানত ডক্টর শহীদুল্লাহ, প্রবোধ বাগচী, মণীন্দ্র মোহন বসু, সুকুমার সেন ও অতীন্দ্র মজুমদারের লিখিত গবেষণা গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। অতীন্দ্র মজুমদারের 'চর্যাপদ' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই তথ্যপূর্ণ সুলিখিত গ্রন্থটী নীরস চর্যাপদের আলোচনাতে সরসতা এনেছে।

এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে ডক্টর শহীদুল্লাহর সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছি। তার সাহায্য ও উপদেশ ছাড়া এ লেখা শেষ করা সম্ভব হত না। বলা বাহুল্য তিব্বতী, সংস্কৃত, অসমীয়া ভাষায় তার যে-গভীর জ্ঞান আছে চর্যাপদ সম্বন্ধে গবেষক অন্য কোন পণ্ডিতের তা নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরেই চর্যাপদের বিচার ও তার ভাষাতত্ত্ব, এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহর দান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

॥ তথ্যসঙ্কেত ॥

১. হাজার বছরের পুরান বাংলাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা — দ্বিতীয় সংস্করণ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

২. Origin and Development of the Bengali Language
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬

৩. Buddhist Mystic Songs — ডক্টর শহীদুল্লাহ

৪. Materials for a critical edition of Charyapada : Journal of Department of Letters, Calcutta University Vol. XXX
ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী

৫. চর্যাগীতি পদাবলী ... ডক্টর সুকুমার সেন

৬. চর্যাপদ ... মনীন্দ্র মোহন বসু

৭. ,, ... অতীন্দ্র মজুমদার

৮. চর্যাগীতি পরিচয় ... সত্যব্রত দে

৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ... ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ... ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১১. Background of Assamese culture — রাজমোহন নাথ

১২. কদলীরাজ্য ... ,,

১৩. An Account of Assam ... Francis Hamilton

১৪. Early History of Kamrupa ... Kanak Lal Barua

১৫. বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড) ... ডক্টর শহীদুল্লাহ

১৬. সাহিত্য পত্রিকা ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ... সুখময় মুখোপাধ্যায়

১৮. Journal of Assam Research Society